Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.157-167
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের নারীচেতনা

পৌলমী চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

***Abstract*:**

Rabindranath Tagore wrote about the real women of colonial India in all their raw beauty, when they were way ahead of it, maybe even to the present day. Women confront questions of chastity, sexuality, domesticity, and self-identity. This paper discovers Rabindranath Tagore engagement with the gesture of feminist approach in his writings in the nineteenth century Bengal. His writing became the bludgeon for expressing his faith for the empowering of women through his different writings. His writing generally focuses on women's equality, freedom, self-esteem and rights. This paper focuses on female characters by content analyzing the different picture of women by scripting their lives. The paper focuses on gender equality and many relationships. Here, a relationship is defined as an extension of domestic relationships to the community in such a way as to achieve progressively higher levels of social integration and extensive social networks through marriage agreements and lines of descent. The methodology used in the study is content analysis on the type of literature Tagore provided in his study about the women in his different stories. The paper deals with the different picture of women and comparing those nineteenth century women with that of today's women and their status in today's scenario and the changes which took place till today.

Keywords: gender, marriage, empowerment, freedom, equity.

"For women who want something special and violent in their surroundings to keep their interests, only prove that they have lost touch with their own true world"[i]

রবীন্দ্রমানস চিরদিন হৃদয়বৃত্তির স্বাভাবিকতার লীলাময় রূপের ক্ষেত্রে সন্ধান করে চলেছেন অরূপরতনের, তাঁর সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচন ও পরিণতি পাঠক মনকে যাত্রাপথ দেখিয়েছিলো এক বেদনাঘন রসলোকের। ছোটো ছোটো প্রাণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যথা-পরিকীর্ণ অন্তর্লোকের নিভৃত পথে তাঁর ছিলো অনায়াস-বিচরণ। কবিজনোচিত গীতিধর্মীতা, দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব বিকাশ ও কল্পনার উৎসার সেই পর্বের সাহিত্যগুলিকে মহত্তর মর্যাদা দান করেছে। মানবমনের গভীর লীলাবৈচিত্র্য ছিলো তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সমাজের চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি অবিচলিত মনোভঙ্গি, সহজিয়া সৌন্দর্যবোধের ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তথা ভাবজগত। সমাজ-বৃত্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘটিত কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে আপাত-তুচ্ছ ঘটনাবলীর তুচ্ছতার

বিরুদ্ধে যথার্থ মূল্যায়নের আধার হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-সাহিত্য। নারীভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অন্যতম চিন্তক। তাঁর সাহিত্যে নারীচরিত্রের বিকাশ ও চিত্রায়ন বিচিত্রতর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষীয় সমাজে নারীর অবস্থান তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, তাঁর নারীচেতনা সেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও দূরদর্শিতাজাত। রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি তাঁদের অধিকারের প্রতিও ছিলেন সচেতন। নারীদের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের যে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের সৃজনে প্রতিফলিত তা আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা সংকীর্ণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্ফূরণ তাঁর সৃজিত নারীচরিত্রগুলিতে প্রকট তা থেকে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীদের সমানাধিকারের প্রসঙ্গ বিদ্যমান, তেমনি প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিও বিদ্যমান, কিন্তু প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ যা কিনা আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ আরোপিত কর্তব্যপালনের নৈপুণ্য, তাও রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ণিত। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ হিসাবে স্বীকার করে নিলে তৎকালীন নারীদের মধ্যে তিনি এই উভয় দিকটিই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তুলনায় প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ যে খন্ড প্রকাশ এ বিষয় প্রশ্নাতীত। বিশ্ব সংসারের ব্যপ্ত ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে নারীর স্বীকৃতির বিষয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার প্রসঙ্গে বারংবার রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীকে দেখা যায় ব্যক্তিত্বময়ী।

ক্রমে কালের আবর্তনে বিংশ শতকের প্রথম দশকেই পৃথিবীকে ঘিরে নিলো বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, এবং তার অনতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ পরিচিত উঠলেন পাশ্চাত্য জগতে। প্রথম মহাযুদ্ধের মারণ-যজ্ঞের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে সপ্রশ্ন-দৃষ্টি, প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রতি অবিশ্বাসের ছায়াপাত সমাজে এক গভীর অবক্ষয়ের সূচনা করে ছিলো, যা পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য সমস্ত শিল্পাচেতনাতেই চিহ্নিত করে দিয়েছিলো আপন প্রভাব। রবীন্দ্র মানসও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজ-জীবনের জটিল আবর্তের লীলাময়তা ও সমাজস্বীকৃত কাঠামোর বিরুদ্ধাচরণ বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ের রবীন্দ্র ছোটোগল্পে ও সাহিত্যে। মানবমনের অতলে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের যে প্রবাহ নিরন্তর প্রবহমান, অথচ যা সমাজ কাঠামো অনুসারী নয়, তারই ছায়াপাত ঘটেছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। কবি মানসিকতাজাত ভাবপ্রবণতার পরিবর্তে প্রাধান্যলাভ করেছে কার্য-কারণলব্ধ জ্ঞান ও যুক্তিধর্মীতা। মানবমনের সংগোপনে সুপ্ত আবেগের ক্রমপরিণতি ও তার আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ চরিত্রগুলিকে নিয়ে গেছে এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে। নবজাগরণের প্রভাবস্বরূপ মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' থেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারী, বিনোদিনী বা নন্দিনীর মধ্যে নারীর যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ দীপিত, তা অতুলনীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনায় বিবর্তনটিও লক্ষ্যণীয় বিষয়।

"Women have to be ready to suffer. She cannot allow her emotions to be dulled or polluted, for these are to create her life's atmosphere, apart from which her world would be dark and dead. This leaves her heart without any protection of insensibility, at the mercy of the hurts and insults of life. Women of India, like women everywhere, have their share of suffering, but it radiates through the ideal, and becomes, like sunlight, a creative force in their world. Our women know by heart the legends of the great women of the epic age - Savitri who by the power of love conquered death, and Sita who had no other reward for her life of sacrifice but the sacred majesty of sorrow. They know that it is their duty to make this life an image of the life eternal, and that love's mission truly

performed has a spiritual meaning. It is a religious responsibility for them to live the life which is their own. Their activity is not for money-making, or organizing power, or intellectually probing the mystery of existence, but for establishing and maintaining human relationships requiring the highest moral qualities. It is the consciousness of the spiritual character of their life's work, which lifts them above the utilitarian standard of the immediate and the passing, surrounds them with the dignity of the eternal, and transmutes their suffering and sorrow into a crown of light."[ii]

নারীর দুঃখবরণকে তিনি যেমন মহিমান্বিত করেছেন, এই দুঃখবরণের প্রতিফলের সদর্থকতা প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন, একজন যৌক্তিক চিন্তকের মতো তিনিই বিবর্তিত মানসে উচ্চারণ করেছেন-

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ।
যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী--
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।..."[iii]

এখানে 'বিধাতা' শব্দে যে সমাজনিয়ন্তা পুরুষতন্ত্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে, তা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থান বিষয়ক যে মহিমান্বিত ধারণাটি সমাজে বর্তমান, সেই ধারণা যে বহুলাংশে অলীক ও অযৌক্তিক তাঁর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে। 'মনুসংহিতা'

থেকে 'মহাভারত'- এর অনুশাসন পর্বে নারীবিদ্বেষ ও নারী সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার যে দৈন্য প্রকট হয়ে উঠেছে, তা প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন ধারণার জনক হতে পারে -

"প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু আজকাল মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চা দেশে এতটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অধিকার অনেকেরই জন্মিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবুর মত সত্য কি মিথ্যা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু বলিতে পারি যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মত ভালোরূপ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন দুই-একটি শ্লোক আপন মতের স্বাপক্ষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তেমনই অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার মতের বিপক্ষে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোক পাঠ করিবেন, আমি কেবল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক এইখানে পাঠ করি।

শয্যাসনমলংকারং কামং ক্রোধমনার্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।

শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতুক স্ত্রীলোকের মন্ত্রদ্বারা কোনো ক্রিয়া নাই ধর্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্মজ্ঞানহীন মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যা পদার্থ।

এ-সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না।"[iv]

ভারতে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় তাই নারীরা কেবল দৈনন্দিন ও শারীরিক প্রয়োজনীয়তা নিবৃত্তির উপাদান হিসাবেই বহু যুগ ধরে ব্যবহৃত। কোলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব কীভাবে একটি নারীজীবনে বিপর্য্যস্ত করতে পারে সেই সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিলো-

"সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশে সর্বসাধারণের সংস্কার এই যে, স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দেবতা ইহা ইতিপূর্বে শুনা যায় নাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন, তৎপূর্বে তিনি আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, আপনাকে সম্মান করিতে কেহ বাধ্য নহে, কিন্তু মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে সকলে বাধ্য। দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনোই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্ম-দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাটসভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই। মনুসংহিতার দণ্ডবিধির মধ্যে এক স্থলে আছে-

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতা চ সোদরঃ

প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ সূরজ্জ্বা-বেণুদলেন বা।
স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর কনিষ্ঠভ্রাতা যদি অপরাধ করে সূক্ষ্ম রজ্জু অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাড়ন করিবে।"[v]

হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য যে সাম্যকে স্বীকৃতি দেয় না, বরং তা কেবল পারিবারিক মঙ্গলসাধনের একটি সুলভ উপায় তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির অতীত ছিলো না, হিন্দুবিবাহের মূল উদ্দেশ্যে কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিকতা যে নিহিত নেই বরং তা সমাজ ও সংসারের মঙ্গলসাপেক্ষ, সন্তানলাভার্থে ঘটে থাকে, অর্থাৎ নারীদের কেবল ব্যবহার করা হয় সংসারহিতার্থে।

"কিন্তু একীকরণ বলিতে বোধ করি এই বুঝায় যে, প্রেমবিনিময়বশত স্বামীস্ত্রীর হৃদয়মনের সর্বাঙ্গীন ঐক্য; এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু প্রেমপ্রভাবে হৃদয়ের ঐক্য যেখানে মুখ্য আদর্শ সেখানে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মিলন যদি হিন্দুবিবাহের যথার্থ প্রাণ হইত তবে এ দেশে কৌলীন্য বিবাহ কোনোমতে স্থান পাইত না। বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না।"[vi]

ভারতবর্ষে নারী সমাজ শিক্ষা ও কর্মব্যপ্তির দিক থেকে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে, এবং পরিবর্তিত পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রয়োজনের সমষ্টি, যা বিশ্বসমাজের পক্ষে কল্যাণকর, তার জন্য নারীদের সাংসারিক সংকীর্ণ সীমানা পেরিয়ে আত্মনিয়োগের যে প্রয়োজন,তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। নারীদের বিপুলা শক্তির দ্বারা যে কল্যাণ সম্ভবপর হতে পারতো, ভারতবর্ষীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সাংসারিক সীমানাতেই তার অপচয় ঘটেছে। স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নারীকে ভারতীয় সমাজ স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছে।

"এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এশিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না- তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাভ্যস্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।"[vii]

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের বহু বিচিত্রতা সম্পূর্ণ করার জন্য নারীদের ঐকান্তিক প্রয়োজন। কেবলমাত্র সংসার লালন তার জীবনের অভিন্ন ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য হতে পারে না, কারণ নারী ও পুরুষ উভয়েই এই পৃথিবীর বাসিন্দা, পৃথিবীর উপর তাদের কর্তব্যেও তাই সাম্য থাকা উচিত-

"কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ ক'রে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর

বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্রমেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি, বাট্‌না-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যের অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য-বাজারদরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও ষোলো আনা খাটছে না। যে-বিদ্যার মূল্য সার্বভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা-যাচাইয়ের জন্যে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।"[viii]

'স্ত্রীর পত্র'-গল্পে মৃণাল ও 'পয়লা নম্বর' গল্পে অনিলার সংসারিক অসহনীয়তা তাদেরকে সংসার ছেড়ে পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর রাখেনি। মৃণাল বিন্দুর প্রতি অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো, বিন্দুর মৃত্যুর কারণ উপলব্ধি করতে তার অসুবিধা হয়নি স্বাভাবিকভাবেই। তাই মৃণাল সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধের কারণেই। অন্যদিকে 'পয়লা নম্বর' গল্পে অনিলাও গৃহত্যাগ করেছে স্বামী অদ্বৈতের উদাসীনতার কারণেই। শুষ্ক জ্ঞানচর্চাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত অদ্বৈতের জীবনবৃত্তে সাংসারিক প্রয়োজন ব্যতীত স্থান পায়নি অনিলা। অনিলার প্রতি আসক্ত সীতাংশুমৌলীকেও অনিলা আশ্রয় ভাবতে পারেনি। গল্পে অদ্বৈত ও সীতাংশু উভয়েই অনিলাকে তাদের মতো করে পেতে চেয়েছে, তার গোপনতম মনোলোকটির খবর রাখেনি কেউ, অথবা সীতাংশু অনিলার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েও বাস্তবে নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের উপলব্ধি হল, 'আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।

"তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া যখন সেই সম্ভাবনার কথা আর কেউ জানত না, সেই শিশুবয়সে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সান্নিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলুম। পাড়ার সব মেয়েরাই বলতে লাগল, 'মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?' চুরিবিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের পরেই তার লোভ।

আমার মরণ নেই। সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি।"[ix]

তৎকালীন বঙ্গীয় নারী সমাজের জীবন যন্ত্রণার নিরসনের উপায় হিসেবে সক্রিয় হয়ে না উঠে কেবল মৃত্যুর স্মরণাপন্ন হওয়ার মতো সিদ্ধান্তকে মৃণাল স্পষ্ট ভাষায় অসমর্থন করেছে -

"বাঙালির মেয়ে তো কথায় কথায় মরতে চায় কিন্তু এমন মরার বাহাদুরিটা কি?"[x]

এখানে মৃণালের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেযুগে দাঁড়িয়েও আত্মহত্যার বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যা কবিগুরুর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তার পরিচায়ক। সংসার জীবনে অবহেলিত মৃণালের ব্যক্তিগত কবিপ্রতিভাও রয়ে গিয়েছিলো সকলের অগোচরে, যেখানে মানুষ শিল্পী সেখানে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাস। মৃণালের এই কবিসত্তাটি বৈবাহিক জীবনে তার সংসারে এমনকি তার স্বামীর কাছেও কোনরকম উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সাংসারিক জীবনের একঘেয়ে বৃত্তে গোপনেই থেকে যায় নারীদের সৃজনশীল প্রতিভার স্ফূরণ -

"আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জান নি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠে নি। সেইখানে আমার মুক্তি; সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে, সে তোমরা পছন্দ কর নি, চিনতেও পার নি; আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।"[xi]

ভারতবর্ষের সমাজ দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে পুরুষতন্ত্র। এই তন্ত্র যেমন বাহ্যিকভাবে নারীদেরকে অবদমিত করে রেখেছে নিয়মের শৃঙ্খলে অন্যদিকে মানসিকভাবে এই তন্ত্রের প্রতি নারীদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছে কৌশলে। এই বাহ্যিক ও মানসিকভাবে নারীদের পুরুষতন্ত্রের অনুগামী করে তোলার সূক্ষ্মবিস্তৃত কৌশলটি কোনোদিন সমাজে সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত নারীর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। 'পয়লা নম্বর' গল্পে অনিলার স্বামী অদ্বৈতের স্বীকারোক্তিতে তার বিগত চেতনার স্বরূপটি ধরা পড়ে-

"সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয়, তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্দ্যোগপর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নি।"[xii]

স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণাল, পয়লা নম্বর গল্পে অনিলা, 'ল্যাবরেটরি'-র সোহিনী চরিত্র গুলির মধ্যেই নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার প্রকৃত স্বরূপটি। ল্যাবরেটরি গল্পে এক ভিন্ন পরিবেশ থেকে সোহিনীর নন্দকিশোরের সঙ্গে চলে আসা এবং সামাজিক ধর্মীয় রীতিনীতিকে অস্বীকার করে নন্দকিশোরের সঙ্গে একত্রে বসবাস ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার কারণ হয়েছিল একদিন। কেবল প্রথার আনুগত্য করে সমাজে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীতও দুইটি মানুষের পরস্পরকে ঋদ্ধ করা, সাহায্য করা এবং পারস্পরিক উন্নতিতে আত্মনিয়োগ যে সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেছেন-

"নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেটা খুব নির্মল নয়, এবং নিভৃত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মানুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্য করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্যমতো। লোকে হাসত যখন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, 'ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি। 'নন্দ বলতেন, 'না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।' বলত, 'আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।'

"সে কী হে।" (নন্দকিশোরের বন্ধুবর্গ)

'স্বামী হবে এঞ্জিনীয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"[xiii]

চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, গোরা প্রভৃতি উপন্যাসেও নারীরা তাদের অবস্থানে প্রোজ্জ্বল, সেখান থেকে রবীন্দ্র চেতনার নিরূপণ অসম্ভব নয়। 'চোখের বালি'র ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অনুসন্ধানের কথা জানান। মানব মনের 'আঁতের কথা-র স্বরূপ উন্মোচনে তার এই উপন্যাসে সহায়ক চরিত্রগুলি 'বিনোদিনী' ও 'আশা' চরিত্র দুটি অন্যতম। মানব মনের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক নিয়ম নীতির তরঙ্গ দ্রাঘিমার মিলনক্ষেত্র রচনা যে সব সময় সম্ভবপর নয়,কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব চরিত্রের সমস্ত উপাদান যে তার মানসিকতার উপরেই নির্ভরশীল, তা ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের সমাজ আনুগত্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তাকে অধিক প্রাধান্য দিতেন বলে মনে হয়। যুগ যুগান্ত ধরে চলে আসা সংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেন এই উপন্যাসের মাধ্যমে। চিরায়ত সংস্কারের সঙ্গে মানব প্রবৃত্তির বিরোধ এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। বাল্য বিধবা বিনোদিনীর প্রেমের স্বরূপ উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ যেমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি এই বিষয়টিকে নিয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, ফলে বিনোদিনীর কাশী যাত্রা। সমাজনীতি বহির্ভূত প্রেমকে তিনি যেমন অস্বীকার করেননি তেমনি তাকে সমাজবৃত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতাও অনুভব করেননি কখনো।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে আবার নৌকাডুবির শিকার হয়ে না জেনেই কমলা, রমেশকে স্বামী রূপে বরণ ক'রে তাকে ভালোবেসেছিলো, কিন্তু প্রকৃত সত্য উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই সে নলীনাক্ষ অর্থাৎ তার সমাজ নির্দিষ্ট স্বামীকেই বরণ করে নিতে পেরেছে অনায়াসে। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী মানসিকতার যে সংস্কার আচ্ছন্নতা প্রকট হয়েছে তাতে প্রেমের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক সম্পর্ক, অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তার উর্ধ্বে অবস্থান করেছে সামাজিক সত্তা। অন্নদাশঙ্কর রায় এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন-

"নৌকাডুবির কমলা, রমেশ মানুষটিকে কোনদিন ভালোবাসেনি, ভালোবেসেছিল রমেশকে বিগ্রহ করে স্বামীকে। যেই জানলে বিগ্রহটি আসল নয় নকল, অমনি তার ভালোবাসার বিগ্রহ বদলালো। এতদিনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ এক নিমিষে মিথ্যে হলো দুঃস্বপ্নের মতো। একটা দ্বন্দ্ব পর্যন্ত মনের স্থান পেলে না। সে তো মানুষ নয়, সে হিন্দু নারী! সে তো মানুষকে ভালোবাসতে পারে না, সে মূর্তিকে ভালোবাসে।...ভারতের মেয়ে স্বামী ছাড়া অপরপুরুষকে যদি ভালোবেসে ফেলে, তো অপর পুরুষকে স্বামী ভেবে শ্রদ্ধা করতে পারে না, পূর্ব স্বামীকে পরপুরুষ বলে উড়িয়ে দিতে পারেনা, বিবাহ ভঙ্গ ও পুনর্বিবাহের কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনা, সমাজকে তার এত শ্রদ্ধা যে সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শ্রদ্ধা দাবি করবার ভাবনা মনেই আনতে পারেনা।"[xiv]

ঘরে -বাইরে উপন্যাস রাজনৈতিকভাবে উত্তাল প্রতিবেশে চিত্রিত। নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ- এই ত্রিকোণ সম্পর্কের ভিত্তিতেই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটি রচিত। নিখিলেশের মনে, তার স্ত্রী বিমলাকে আধুনিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা এবং তাকে বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অভীপ্সা বর্তমান ছিলো। 'স্ত্রী' শব্দটির মতো একটি সংকীর্ণ পারিবারিক পরিচয় রূপ যে

নিখিলেশ বিমলাকে অনুভব করতে চেয়েছিলো। সাংসারিক ভূমিকার সীমানা অতিক্রম করে সে গুরুত্ব দিয়েছিলো বিমলার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে, ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ির সন্তান হয়েও যা তার নব্য শিক্ষার প্রকৃত ধারকের পরিচায়ক। সমাজে বিবাহরীতির দ্বারা যে স্ত্রীকে সে লাভ করেছিলো, তা একটি প্রথাগত যান্ত্রিকতা কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলো সে। বিমলার নিখিলেশের প্রতি যে ভালোবাসা, যে অনুভব – তা কেবল বিবাহ সম্পর্ক জনিত সামাজিক প্রথার একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া কিনা নিখিলেশ তা বুঝতে চেয়েছিলো। বিমলা সন্দীপের প্রতি সাময়িকভাবে আকর্ষিত হয়েছিলো। সন্দীপ বিমলাকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলো আপন অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিত্বের আপাত দেদীপ্যমানতাকে অস্ত্র ক'রে। বিমলা যখন সন্দীপের প্রতি তার অনুভবের কথা অনাবিল উপলব্ধি করতে পেরেছে, সে নিজেকে ঘর বন্দি করার চেষ্টা করেছে দু'দিন, কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন তা তার অন্তরে আকর্ষণের তীব্রতা সম্পর্কে তাকে অবগত করিয়েছে। নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখতে চেয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু দুর্দমনীয় অনুভবকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিমলার মনে পৌরুষের যে সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়েছিলো, তার সঙ্গে সাদৃশ্যবশতই সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো বিমলা। যদিও পরবর্তীকালে সন্দীপ চরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করে সে স্বেচ্ছাতেই সে পথ থেকে সরে এসেছিলো। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা সংজ্ঞায়িত পুরুষের ধারণা নারী মানসিকতায় কীভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা স্পষ্ট দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্যদিকে আপন বিবেচনা শক্তির দ্বারাই নারী যে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে সেই দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে প্রবৃত্তির সংযম যে কত কঠিনসাধ্য তারও ইঙ্গিত রয়েছে। বিমলা আত্মপতনের ইঙ্গিত পেলেও প্রবৃত্তি সংযম তার পক্ষে ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিলো। সেখানেও নারী তাকে জয় করেছে।

'মুক্তি' কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নারীর অন্তরের ক্ষোভ। সমাজ দৃষ্টিতে ভালো মানুষ হওয়ার উপায় হয়েছে সাংসারিক জীবনে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে অবদমন করে নীরব অস্তিত্ব যাপন করা, এখানে সমাজের নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটিও উন্মোচিত। নারী জীবনের অসহায়তার করুণ আর্তনাদটিই যেন ধ্বনিত হয়েছে কবিতায়। মরণকেই সেখানে একমাত্র আশ্রয় ভাবতে বাধ্য হয়েছে সে।

"নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে, লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি।...
...মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।"[xv]

বাল্যবিবাহের বিষয়টি ও তার বীভৎসতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'নিষ্কৃতি' নামক কবিতায়। সমাজের উচ্চস্তরে আরোহণ করার অভিপ্রায়ে কন্যাকে বয়স্ক পাত্রে পাত্রস্থ করার কথা পিতা যে সমাজে ভাবতে পারে অনায়াসে, তার প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচন হয়েছে কবিতায়-

মা কেঁদে কয়, "'মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে?--বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো;--
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।"
বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো!
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব।"[xvi]

বিংশ শতাব্দীর ষাট থেকে সত্তর দশকের মধ্যে নারীবাদীরা তাদের আন্দোলনের কর্মসূচির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এর ফলে সেই সময় থেকেই নারীবাদীরা বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব সৃষ্টিতে মনোযোগী হন। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের উপস্থিতি সনাক্ত করে পুরুষ কেন্দ্রিকতাকে নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনীয় নারীবাদী তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করার কাজ বিংশ শতাব্দীতে সবে শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ে Sandra Harding, Helen Longino প্রমুখ নারীবাদী চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ থেকে বহুদিন পূর্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজপরিবার থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত অসংখ্য নারীর চরিত্রকে তাঁর গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতিতে স্বমহিমায় উপস্থাপন করেছিলেন। যেখানে কোন নারী চরিত্র অন্যটির মতো নয়। তাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের জীবন ভাবনা সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর গান, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সর্বত্র তাঁর নারী চরিত্রের মধ্যে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নারীবাদী চিন্তার উন্মেষ আমরা দেখতে পাই। এর থেকে একথা খুব সহজেই বলা যায়, আধুনিক বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের যে ধারা প্রকট হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রগুলি সেই ধারারই যথার্থ পূর্বসূরী।

তথ্যসূত্র:

1) আমেরিকায় ১৯১৭ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ উক্তিটি করেন, যা পরবর্তীকালে 'personality' নামক প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশ পায়।
2) Rabindranath Tagore, Creative Unity, Hilma af Klint, Sweden, 1922, pg. 51-52.
3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৪।
4) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৫৮।
5) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৬০।
6) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৭০।
7) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬২২-৬২৩।
8) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬২৩।
9) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, স্ত্রীর পত্র, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৭৫।
10) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, স্ত্রীর পত্র, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৭৭।
11) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, স্ত্রীর পত্র, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৭৬।
12) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পয়লা নম্বর, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৬২৭।
13) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ, পয়লা নম্বর, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৭০৩।
14) সুরজিৎ দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৯-১০।
15) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৯-১১।
16) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২০-২১।